দ্য কোলাবরেটর

কাশ্মীর: ভালোবাসা, শোক আর বিশ্বাসঘাতকতার ইতিহাস

মির্জা ওয়াহিদ

ভাষান্তর : এ.এস.এম. রাহাত

প্রিমিয়াম পাবলিকেশন্স

উৎসর্গ

কাশ্মীরের জনগণকে—

উৎসর্গ

অধ্যায় : এক

এখন এবং তখন

হলুদ ফুলে সুশোভিত উপত্যকা ৭
মনোনীত ব্যক্তি ১৬
মায়ের ছোট্ট বাগান ২৪
হোসেন নিখোঁজ হওয়ার পর ২৮
নীরব বৃক্ষরাজি ৩৭
হোসেন এবং আমি ৪৩
অনুশীলন ৪৮
মোহাম্মদের কুকুরটা ৫৪
পারিবারিক ভোজসভা ৫৯
পাহাড়ের সেই ভয়ংকর রাতটা ৬১
কিচিরমিচির ৬৮
পথপ্রদর্শক ৭৪
দ্বিতীয় মৃত্যু ৮০

অধ্যায় দুই

এরপর...

একজন পিতার অঙ্গীকার ৮৩
রাস্তাটা ৮৮
একটু দুধ ভিক্ষা দিন... ..... ৯৪
বড় ভাইটি ৯৬
নূর খানের কান্না ১০৪
ছুরির ডগা ১০৭
শান্ত নওগ্রাম এবং এরপর ১১২
সরকারের উপহার ১১৮

কাফেলা ১২৩
আর্মি অফিসারের আগমন ১৩১

অধ্যায় তিন

এখন...

সিদ্ধান্ত ১৩৫
পিয়নের আসল পরিচয় ১৩৮
গুপ্তচর ১৪২
স্টোররুমটা ১৪৯
কাদিয়ানের থাকার ঘর ১৫১
কবরগুলো একদিন ওরা নিশ্চয়ই খুঁজে পাবে ১৫২
অতীত, বর্তমান ১৫৩
অন্তিম যাত্রা ১৫৬

১

হলুদ ফুলে সুশোভিত উপত্যকা

মদের বোতল থেকে একটু মদ গ্লাসে ঢেলে নিলো ক্যাপ্টেন কাদিয়ান। তারপর কয়েক চুমুক দিয়ে চোখ বন্ধ করে বিড়বিড় করতে লাগলো, 'এটা তেমন কোনো কঠিন কাজ না। তুমি শুধু দশ-পনেরো দিনে একবার পাহাড়ের পাদদেশে যাবে, জিনিস নিয়ে ফিরে আসবে...খুব সোজা কাজ। তারপর পকেটভরতি টাকা নিয়ে বাড়িতে ফিরবে, ব্যস।' চোখ খুলেই আমার দিকে কড়া করে তাকালো একবার। জানতে চাইলো, 'ঠিক আছে?'

আমার বুকের ভেতরটা ধুকধুক করছে। একজন আর্মি অফিসারের মুখের উপরে না করার হিম্মত আমি পাচ্ছি না। আবার হ্যাঁ বলে দেবো, ওতেও মন সায় দিচ্ছে না। কয়েকবার ঢোক গিলে জবাব দিলাম, 'স্যার...বলছিলাম কী...এটা তো আপনাদের জন্য আমার চেয়ে সোজা কাজ। আপনার সৈন্যরা তো জানেই পাহাড়ের কোন অংশে কয়টা লাশ পড়ে আছে। সৈন্যরা চাইলেই টুপ করে কাজটা সেরে ফেলতে পারবে। এই উপত্যকার সবটা ওরা চেনে।'

'একদম চুপ!' ক্যাপ্টেন কাদিয়ান ধমকে উঠলো। 'আমাকে বোকা পেয়েছ? ওটা নো ম্যানস ল্যান্ড। নো ম্যানস ল্যান্ড বোঝো? ওখানে ভারতীয় আর্মির পোশাক পরে কেউ গেলে সে আর জ্যান্ত ফিরবে না। ঠুস করে গুলি করে মেরে দেবে ওদিক থেকে। এছাড়া তুমি হলে এখানকার লোকাল কাশ্মীরি। বর্ডার সাইডে তোমরা কত কত ট্যুরিস্ট গাইড-টাইড করে বেড়াও। ওরা তোমাদের চেনে। তোমাকে ওরা কিছুই করবে না।'

'স্যার, আমি বলছিলাম কি...'

টেবিলে সজোরে আঘাত করলো ক্যাপ্টেন। 'আমি বলেছি শুধু আইডি কার্ড আর লাশের পাশে পড়ে থাকা অস্ত্রগুলো এনে দেবে। এর বেশি কিছু শুনতে চাচ্ছি না।'

আমাদের মাথার উপরে একটা ঝাপসা বাল্ব ঝুলছে, চারদিকে কিচিরমিচির করছে পোকামাকড়। আমার ভেতরটা ভয়ে কুঁকড়ে যাচ্ছে। ক্যাপ্টেন তার লাল চেয়ারটা টেনে নিলো। ওটাতে ঝুঁকে বসলো একবার। আমি প্রশ্ন করলাম, 'তার মানে লাশের বডি নিয়ে আমাদের কোনো চিন্তা নেই। তাহলে লাশটা কী করবো?'

'দেখো, খুব সোজাসাপটা হিসাবনিকাশ। ওরা চুপিচুপি আসে। আমাদের চোখ ফাঁকি দিয়ে পালাতে চায়। আমরা আর আছি কেন? সব শালাকে গুলি করে মারি। এদের কৈ মাছের প্রাণ। তাও কীভাবে জানি ফাঁকি দিয়ে চলে যায়!'

কাদিয়ান আরো কয়েক গ্লাস মদ গিলে নিলো এর মাঝে। তার শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ আরো ঘন হচ্ছে। এদিকে মদের কটু গন্ধ সহ্য হচ্ছে না আমার।

কাদিয়ান আবার চেঁচালো, 'শালারা দলে দলে মেশিনগান নিয়ে ঢুকে পড়ছে। সব কটাকে জ্যান্ত কবর দেবো আমি!' বাইনোকুলারটা হাতে নিয়ে জানালা দিয়ে দূরে কোথাও দেখলো সে।

আমার সবকিছু মনে পড়তে শুরু করলো। ছোটবেলা থেকে এখন পর্যন্ত কাটানো স্মৃতিগুলো মনের আকাশে উঁকি দিচ্ছে। আমরা বাচ্চাদের দল নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়তাম। নদীর পাশেই ছিলো আমাদের ক্রিকেট খেলার মাঠ। জঙ্গলে ঘেরা পাহাড়ের মধ্যখানে ওটা একটা ছোট্ট উপত্যকা। এর পেছনেই ছড়িয়ে আছে সারি সারি পাহাড়ের সন্নিবেশ। উঁচু উঁচু পাহাড়ের মধ্যখানে এই ছোট্ট জায়গাটা দিনের বেলায় ছায়ায় ঢেকে থাকে। আর রাতে নামে তীব্র গাঢ় অন্ধকার। যেদিকে তাকাই, যেন সৌন্দর্য আপন মহিমায় জানান দিয়ে যায় তার আসল রূপ।

ওগুলো পেরিয়ে আরেকটু সামনে গেলেই আজাদ কাশ্মীর, পাকিস্তান।

আমাদের ছোট্ট ঐ গোপন জায়গায় মন চাইলেই ছুটে যেতাম। খেলতাম, নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়তাম। কেউ আমাদের বাধা দিতো না। পাকিস্তান বা ভারত কেউই আমাদের শত্রু মানতো না। তারা জানতো আমরা বাচ্চা, এই মাটিরই সন্তান। উপত্যকার নিচে আমার আগে থেকেই যাতায়াত ছিলো বলেই কি ওরা আমায় বেছে নিয়েছে? হয়তো বা।

কাদিয়ান চেঁচিয়ে বললো, 'প্রতিবার উপত্যকার নিচে যাওয়ার জন্য তোমায় পাঁচশো রুপি করে দেওয়া হবে। আর আইডি কার্ড এবং অন্য সব আনার জন্য বাড়তি বোনাস তো আছেই।'

আমি মনে মনে হিসাব করতে থাকলাম আর্মির হয়ে কাজ করলে বাবা কী ভাবতে পারেন।

এদিকে মদের বোতলটা রেখে বাইনোকুলার হাতে জানালার দিকে গেল কাদিয়ান। এই ঘরটা এমনিতেই বীভৎস। একটা জানালা আর একটা টয়লেট রয়েছে। জানালায় আর্মির ডিজাইনের একটা পর্দা ঝুলছে।

আমি আমতা আমতা করে বললাম, 'একা একা কীভাবে করবো এসব?'

কাদিয়ান আমার দিকে তাকালো। তারপর জানতে চাইলো পারিশ্রমিক আরো বেশি চাই কি না। সে ব্যাখ্যা করলো, পাকিস্তান থেকে কীভাবে এসব বিচ্ছিন্নতাবাদীরা ভারতীয় কাশ্মীরে প্রবেশ করে। একেক জনের হাতে থাকে অত্যাধুনিক এলএমজি। সে একেকটা দলকে ফাঁদে ফেলে। ওদের শুরুতে ঢুকতে দেয়। যখনই ওরা ভারতীয় অংশে ঢুকে পড়ে, পাহাড় টপকে একটু সমতলে আসে, কাদিয়ান ওঁত পেতে থাকে। সময় বুঝে গুলি চালায় ওদের উপর। তার আশা, অন্তত দলের অর্ধেক বিচ্ছিন্নতাবাদী যেন মারা পড়ে। ওদের

ভাগ্য ভালো যে বড় বড় গাছের আড়ালে লুকিয়ে পড়তে পারে। বলতে বলতে রাগের ঠ্যালায় উঠে দাঁড়িয়ে যায় সে। শালা পাকি বীর্যে জন্মানো শুয়োরগুলো!

আমি তখনো ভাবি, ভারতীয় আর্মি কেন আমাকেই এই কাজে বেছে নিচ্ছে। আমার প্রতিটি শঙ্কার জবাব দিচ্ছে কাদিয়ান। সে ব্যাপারটা মনে করিয়ে দিলো। এই গ্রামের সবাই কোথাও না কোথাও পালিয়ে গেছে। গ্রামে টিকে থাকা একমাত্র উপযুক্ত কিশোর আমিই আছি। অন্য সবার মতো আমাদেরও পালিয়ে যাওয়া উচিত ছিলো। কিন্তু বাবা এক শব্দে বলে দিলেন, আমরা কোথাও যাচ্ছি না। গ্রাম প্রধানের দায়িত্বটা ছাড়লেন না তিনি। তার বিশ্বাস গ্রামের যারা এই কাশ্মীর ছেড়ে পাকিস্তান চলে গেছে, অথবা অন্য কোথাও স্থায়ী হয়েছে, তারা একদিন ফিরে আসবে। যত দিন যাচ্ছে, আরো বেশি মানুষ আশেপাশের গ্রাম ছেড়ে চলে যাচ্ছে। বাবার মনের সেই আশা আর কোনোদিন পূর্ণ হবে না।

যখন আমরা ছোট ছিলাম, ভারত-পাকিস্তান কী বুঝতাম না। উপত্যকার নিচে ছুটে যেতাম। কত কত চেকপোস্ট পার হয়ে আমরা পাহাড়-পর্বতে চড়তাম। না পাকিস্তান, না ভারত–কেউই আমাদের নিয়ে চিন্তিত না। আমরা খেলতাম, গান গাইতাম। আকাশের দিকে তাকিয়ে মাথার উপর উড়তে থাকা মেঘের দলগুলোকে দেখতাম।

দিন বদলে গেছে। উপত্যকার ছেলেপেলেরা যে যেভাবে পেরেছে গ্রাম ছেড়েছে। কেউ কেউ শ্রীনগরে কিংবা সোপুরে থিতু হয়েছে। কেউ কেউ পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। অনেকে কর্মজীবন শুরু করেছে বাসের হেল্পার বা কোনো হোটেলের ওয়েটার হিসেবে। এছাড়াও অনেকে পাড়ি জমিয়েছে পাকিস্তানে। কোনো একটা প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে হয়তো প্রশিক্ষণ নিচ্ছে। ওদের একটাই ইচ্ছা: ভারতের হাত থেকে কাশ্মীরকে উদ্ধার করা। একদিন স্বাধীন কাশ্মীর হবে, এই ইচ্ছা পোষণ করেই কত কত যুবক যে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে নিলো! আমার সবগুলো বন্ধুও অন্যদের মতো হারিয়ে গেল। পড়ে রইলাম শুধু আমি একা।

আমার প্রথম দিনের কাজ শুরু হলো। আমি ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলাম উপত্যকার নিচের দিকে। ঘাস-জঙ্গলের মাঝ দিয়ে হেঁটে চললাম, যেভাবে ছোটবেলায় দলবেঁধে হাঁটতাম। ঠিক কিছুই পরিবর্তিত হয়নি। সেই একই ঘাসের গন্ধ, একই অন্ধকার, একই পাখির কিচিরমিচির।

প্রথম মৃত দেহটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। অজানা ভয় আর অজানা শঙ্কা আমাকে কুরে কুরে খাচ্ছে। এ এক অদ্ভুত অনুভূতি। ওটার সামনে দাঁড়িয়ে কী করবো বুঝে উঠতে পারলাম না। এদিক-সেদিক মিলিয়ে ছয়টা মৃত লাশ পড়ে আছে। কোনোটার মাথার খুলি উড়ে গেছে, কোনোটার হাত নেই, কোনোটা জিভ চেপে মরে পড়ে আছে। রক্ত জমাট বেঁধে আছে চারপাশে। লাশগুলোর উপর উড়ছে পোকামাকড়।

আমি প্রথম লাশটার পুরো শরীর তল্লাশি চালালাম। আমার চাই আইডি কার্ড। ওটা পেলেই চলবে। সবগুলো লাশ ঘেঁটে দুইটা আইডি কার্ড পেলাম। ওখানে দাঁড়িয়ে থাকতে গিয়ে মনে হলো পৃথিবীটা দুলছে। আমার শ্বাস ছোট হয়ে এলো। তাড়াতাড়ি উঠে চলে এলাম।

বিকেল নাগাদ বাসায় ফিরেই পরপর দুইবার গোসল করলাম। সারা শরীর কেমন জানি ঘিনঘিন করছে। খেতে বসে টের পেলাম, কিছুই গিলতে পারছি না। বমি করে বেসিন ভাসিয়ে দিলাম। আমার জীবনের একটা সেরা বাজে দিন কাটলো। মনে মনে ভাবলাম, হায় স্বাধীনতা!

কাদিয়ান আমার কাছে জানতে চাইলো, 'কাল রাতে গোলাগুলি হয়েছে। শুনতে পেয়েছিলে?'

আমি সাথে সাথে জবাব দিলাম, 'হ্যাঁ, শুনতে পেয়েছি। প্রায় চার ঘণ্টা যাবৎ গোলাগুলি হয়েছে। আপনি কি চাচ্ছেন আমি নিচে গিয়ে লাশের বডি তল্লাশি চালাই?'

ক্যাপ্টেন কাদিয়ান হাসলো। 'না। আজ যাওয়ার দরকার নেই। দিল্লি থেকে সাংবাদিক এসেছে। ওরা ঝামেলা পাকাতে পারে। এর চেয়ে বেটার তুমি বাসায় গিয়ে রেস্ট নাও। সাংবাদিক আমি সামলে নেবো। পুরোনো কিছু ছবি তোলা আছে। ওগুলো দেখিয়ে সাংবাদিকদের বুঝিয়ে দেবো, এরা কোনো একটা জঙ্গি সংগঠনের লোক। আরব, আফগানি কিছু একটা বলে চালিয়ে দেওয়া যাবে। সাংবাদিকদের বোকা বানানো বড় কোনো ব্যাপার না।'

কাদিয়ান তার লাল চেয়ারটাতে বসলো। আমার মন চাইলো একটু সাহস নিয়ে জিজ্ঞেস করি, উপত্যকার নিচে ওরা সংখ্যায় কত হতে পারে? এক হাজার? দুই হাজার? নাকি দশ-বিশ হাজার?

আমাদের পুরো গ্রামে কোনো ছেলে অবশিষ্ট নেই। যারা হুট করে উধাও হয়ে গেছে, তারা সবাই নিশ্চিত পাকিস্তান গিয়ে এসব স্বাধীনতাকামী বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠীগুলোতে যোগ দিয়েছে। হতে পারে গতকাল রাতের গোলাগুলিতে তাদের কেউই মারা গেছে?

কাদিয়ান ব্যাখ্যা করলো, 'আমরা যেই পথে আছি সেটাই ভারতীয় কাশ্মীরে ঢোকার একমাত্র পথ নয়। এরকম দশ-বারোটা পথ আছে। ওগুলো দিয়েও স্বাধীনতাকামী বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠীগুলো প্রতিদিন প্রবেশ করে।'

'ওরা সংখ্যায় ঠিক কতজন হবে, স্যার?'

'এত গোনার টাইম আছে? তবে একটা রাফ হিসাব করা যায়। এই ধরো, ওরা ১৯৮৮-১৯৮৯ থেকে এভাবে আসা শুরু করেছে। এখন ১৯৯৩ সাল। তুমি নিজেই আন্দাজ করতে পারবে। সঠিক হিসাব তো বলা যাচ্ছে না।'

আমি একটু কম্পিত গলায় বললাম, 'স্যার, ওরা কি সারা বছরই এভাবে ঢোকে?'